ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 2 1 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

অভিমত

'সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ'

হাসান সাইমুম ওয়াহাব

বেশ কিছুকাল থেকেই বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। যেকোনো বিষয়ের ক্ষেত্রেই কার্যকারণ সম্পর্ক অনিবার্য। ইদানীংকালে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিতর্কটিও এর বাইরে নয়।

এই প্রজন্মের একজন তরুণ হিসেবে যুগোপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক উচ্চশিক্ষার প্রসার কিভাবে করা যায়, সে সম্পর্কে কিছু দিক তুলে ধরাই আমার এ লেখার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগে অধ্যয়নরত আবাসিক-অনাবাসিক ছাত্রছাত্রী, নর্থ-সাউথ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)সহ আরো কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন ছিল দুটি : ১. এ দেশের উচ্চশিক্ষার প্রসার বা গুণগত মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? ২. আপনার বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মান নিয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট? এছাড়াও আমি কথা বলেছি বেশ কিছু অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গেও।

বিগত দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বিস্তারে এগিয়ে আসেন প্রধানত- কিছু শিক্ষাবিদ, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও উচ্চপদস্থ আমলা।

১৯৮৯ সালে সর্বপ্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে পাস হয়। বেসরকারি [illegible]বিদ্যালয়সমূহও সময়ের প্রয়োজনে একটি [illegible]বতা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার এর ইতিবাচকতাকেই প্রমাণ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬টি। যার অধিকাংশই রাজধানী শহরে অবস্থিত। পত্রিকান্তরে জানা যায়, আরো ২২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের অনুমোদন লাভের অপেক্ষায় রয়েছে। (সূত্র : ঢাকা কুরিয়ার, ৭ মে, ১৯৯৯ সংখ্যা)।

আমি যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের বেশির ভাগই এ দেশের উচ্চশিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করেন। এরা প্রায় সবাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক মান নিয়ে সন্তুষ্ট। এদের প্রত্যেকেই মনে করেন যে, বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিয়ে সবার মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার পরিবর্তন প্রয়োজন। সাধারণের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া ছাত্ররাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পড়ছে। যা পুরোপুরি ঠিক নয়। এরা তাদের পছন্দ অনুযায়ীই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এদের সবাই ভালো ফলাফল লাভ করেছিল।

এ দেশের অনেক রাজনীতিবিদ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, এমনকি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ তাদের সন্তানদের বিদেশে পড়াতে পাঠানোর মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বরং এ দেশের সংস্কৃতির মধ্যেই উচ্চশিক্ষা অর্জন করে এ দেশেই আমাদের অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছে। তবে টিউশন ফি আরো কম হলে আরো বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে আকৃষ্ট হতো বলে ধারণা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের আবাসিক ও অনাবাসিক শতাধিক ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি। এর মধ্যে অধিকাংশই (প্রায় ৮০ শতাংশ) এ দেশের উচ্চশিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সহায়ক, ১৫ শতাংশ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করেন। বাকি ৫ শতাংশ এক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। ৯০ শতাংশেরও বেশি শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মান নিয়ে সন্তুষ্ট নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে চমৎকারভাবে (প্রায় দার্শনিকদের মতোই) মতামত প্রকাশ করেছেন দর্শন বিভাগের জনৈক ছাত্র। তার মতে, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ঐতিহ্যই প্রায় অবলুপ্তির পথে। 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড', 'সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ', 'জাতীয় ভবিষ্যৎ'— এ জাতীয় বিশেষণসমূহ নেহায়েতই আবেগপ্রসূত এবং অতীত-সুদূর।" নাম প্রকাশ না করার শর্তে নৃতত্ত্ব বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের আরো একজন আবাসিক ছাত্র জানান, 'ভাই, ১০ জন ভিসি দিয়েও অবস্থার খুব বেশি উন্নতি হবে না।' একটু ব্যাখ্যা করতে বলায় সে বলে, 'আমার বাড়ি মফস্বলে, ঢাকা শহরে তেমন নিকটাত্মীয় না থাকায় হলই আমার রাত্রিযাপনের একমাত্র ভরসা। অথচ প্রথমে আমি সিট পাইনি। পরবর্তী সময়ে বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক নেতার মহানুভবতায় বর্তমানে হলে অবস্থান করতে পারছি এবং বাধ্য হয়েই হাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। এ রকম অসংখ্য ছাত্র রয়েছে।' পরীক্ষার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে মিছিলে যেতে না চাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলের এক নিরীহ ছাত্রকে বাথরুমে ঢুকিয়ে শাওয়ার অন করে দিয়ে ইচ্ছামতো লাঠিপেটা করা হয়। শাওয়ার অন করার তাৎপর্য হলো- অসহায় ছাত্রটির আর্তচিৎকার যাতে অন্যরা শুনতে না পায়। (সূত্র : সমকাল, যায়যায় দিন, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৩৪) উৎসাহী পাঠকগণ এই কলামটি পড়ে আরো অনেক তথ্য পেতে পারেন।

কেউ যদি এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাহলে তাদের কাছে একটি ছোট্ট মিনতি॥ বাণিজ্য করার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। যারা এ রকম চিন্তাভাবনা করছেন বা করবেন বলে মনে করছেন, তাদের এই একটি ক্ষেত্রকে বাণিজ্যের আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

এ বছরের ২৩ এপ্রিল এশিয়া উইকে বিভিন্ন সূচকের বিবেচনায় এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তুলনামূলক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের ১০৪টি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বিশ্ববিদ্যালয় রেটিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭তম স্থান অর্জন করে। যা অত্যন্ত আশার কথা কেননা, সার্ক অঞ্চলে এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করে নিতে পারেনি। গত বছর এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল ৪৪তম। এবারে দেখা যাক, এই উত্তরণের পিছনে কোন কোন সূচক ভূমিকা রেখেছে। মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত প্রথম সূচক ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম (Academic reputation)। এক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০-এর মধ্যে ৯.৪৪ পয়েন্ট অর্জন করেছিল। এ বছর এক্ষেত্রে অর্জিত পয়েন্ট ৯.৫৩। ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৭৭তম। মূল্যায়নের দ্বিতীয় সূচক ছিল ভর্তি প্রক্রিয়া ও ছাত্রছাত্রী নির্বাচন। এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই সূচকে প্রথম স্থান দখল করেছে। মূল্যায়নের তৃতীয় সূচকটি ছিল ফ্যাকাল্টি রিসোর্সেস। এই সূচকে গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল ৪৭তম, আর এ বছর ৫১তম স্থান। গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত বছর ২০-এর মধ্যে ৩ পয়েন্ট লাভ করে ৬৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪১তম স্থান দখল করেছিল আর এবার ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৫তম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মূল্যায়নের শেষ সূচক ছিল আর্থিক সঙ্গতি। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৬১তম যা গত বছর ছিল ৫৬তম। সুনাম, ভর্তি প্রক্রিয়া ও ফ্যাকাল্টি রিসোর্সেসের দিক থেকে ভালো অবস্থানে থাকলেও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কর্মকাণ্ড গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশংসনীয় অবস্থানে নেই। (সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ জুন, ১৯৯৯)।

গত ২৯ মে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এর আনুক্রমিক তৃতীয় কনভোকেশন। এ বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে সর্বমোট ৭৫ জন শিক্ষার্থী তাদের ৪ বছরের স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৩৪ জন। পাশাপাশি সর্বমোট ১৫ জন শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক পাঠ্যসূচির আওতাধীন যৌথভাবে পরিচালিত আইইউবি-এমএসএম (ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিখট স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট)-এর এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও সামগ্রিক মান নিয়ে সন্তুষ্ট। ১৯৯৮ সালের স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী ৩৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৫ জন বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংক, আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এএমএ ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি সরকারি অনুমোদন লাভ করে ৬ নভেম্বর, ১৯৯৫ সালে। (সূত্র : ঢাকা কুরিয়ার, ৭ মে, ১৯৯৯)। সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই যে আইন অনুযায়ী, সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা নয়। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জানায়, তার বিশ্ববিদ্যালয়টি কার্যত ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও ক্যাম্পাসের পরিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বল্পতা, লাইব্রেরি, কম্পিউটার ও গবেষণাগার নিয়েও অনেক শিক্ষার্থী তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কিছু কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণ।

যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনানুযায়ী, সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে, সেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান এবং সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণীই মত প্রকাশ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের সিংহভাগ অর্থাৎ প্রায় ৯১ শতাংশ অর্থায়ন সরকারকেই করতে হয়। যা একটি দরিদ্র দেশের জন্য সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে কোনো রকম সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে, যা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

উচ্চশিক্ষা সবদেশেই একটি ব্যয়বহুল প্রকল্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি সরকারের পক্ষেও এই ব্যয় কুলানো সম্ভব নয়। উচ্চশিক্ষা দিনদিন আরো ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে, যে ব্যয় একজন ছাত্রের পক্ষে মেটানো সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে সমাজ ও সরকারকে একত্রিত হতে হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ব্যয় বেশি বলে এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগালের বাইরে বলে অনেকেই মনে করেন। এক্ষেত্রে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যয়ও কিন্তু কম নয়। সেশনজটে শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হওয়ায় শিক্ষার ব্যয়ও অনেক বেড়ে যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড, কর্নেল, রাশিয়ার মস্কো স্টেট ইউনির্ভাসিটি এমনকি, আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও এর ব্যতিক্রম নয়) প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজের বিত্তবানদের সহায়তায় গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই এসব বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষস্থানীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সময় নিম্নলিখিত দুটি পদক্ষেপের পক্ষে সকলেই মত প্রকাশ করেছেন :

প্রথমত, সরকারি জমি প্রদান : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বেতন বেশি হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে বাড়ি ভাড়া। কেননা, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবকটিই ভাড়া করা ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও ঢাকা শহর এবং শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য জমি ক্রয় করার মতো প্রচুর অর্থও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। অথচ এই ঢাকা শহরেই শতশত একর জমি বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল ও প্রতিষ্ঠান দখল করে আছে। সরকার যদি যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে, সেসব প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাম্পাস নির্মাণে নামমাত্র মূল্যে বা স্বল্পমূল্যে জমি প্রদান করে, তাহলেই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার সাধারণের নাগালের মধ্যে চলে আসবে।

দ্বিতীয়ত, ঋণ প্রদান : বিনা সুদে বা নামমাত্র সুদে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে ঋণ প্রদানের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারে। যেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ খেলাপিদের হাতে সেখানে শর্তসাপেক্ষে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে ঋণ প্রদান করার বিষয়টি অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং সুবিবেচনার দাবি রাখে।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সমাজকে বিদ্যোৎসাহী হতে হবে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন, 'আমাদের সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিগণ ইংল্যান্ডের লেবার পার্টিকে চাঁদা দিতে পারেন, জুতার মধ্যে হীরার বকলস লাগাতে পারেন অথচ যে দেশের মাটি-হাওয়ায় বড়ো হয়েছেন, সে দেশের জন্য তেমন অর্থবহ কিছু দান করতে পারেন না।' কথাটি সত্যিই ভাবার মতো! এ দেশে কয়েক হাজার কোটিপতি রয়েছেন। তাদের সদিচ্ছা থাকলে এক্ষেত্রে অনেক কিছুই করা সম্ভব।

পরিশেষে এ দেশের কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, কেউ যদি এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাহলে তাদের কাছে একটি ছোট্ট মিনতি— বাণিজ্য করার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। যারা এ রকম চিন্তাভাবনা করছেন বা করবেন বলে মনে করছেন, তাদের এই একটি ক্ষেত্রকে বাণিজ্যের আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করছি। কেননা সত্যিকার বিশ্ববিদ্যালয় কখনই বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

হাসান সাইমুম ওয়াহাব : গবেষক।